এথনোমিডিয়ার নাট্য উৎসব

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

নিউজার্সির "এডিসন ভ্যালি প্লে-হাউসে" গত ২৮ ও ২৯ জুন তিনটি নাটক প্রযোজনা করলেন "এথ্‌নোমিডিয়া সেন্টার ফর থিয়েটার আর্টস।" এই নাট্যগোষ্ঠীর গত কয়েক বছরের প্রযোজনা দেখে "ফেরা" ও "রণ" নাটক প্রসঙ্গে আগে লিখেছি।

নাট্যকার ও পরিচালক সুদীপ্ত ভৌমিকের লেখা এবারের তিনটি নাটক "সত্যমেব", "অসময়" এবং "ট্যাকোনিক পার্ক-ওয়ে।" নির্দেশনায় ছিলেন যথাক্রমে ইন্দ্রনীল মুখার্জি, শৌভিক সেনগুপ্ত ও সুদীপ্ত ভৌমিক।

মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন আমেরিকার অভিবাসী বাঙালির যে অন্যধারার জীবনযাপন, সুদীপ্তর নাটকের দর্পণে তার ছায়া পড়ে। চরিত্র ও ঘটনাবিন্যাসে এবারের নাটকগুলির মধ্যে প্রথমটির আবেদন আরও সমকালীন।

"সত্যমেব" নাটকে দুটি চরিত্র। "ইন্টারসফ্‌ট" নামে সফ্‌টওয়্যার কোম্পানির বাঙালি মালিক "বিল", যিনি উচ্চশিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল এদেশে আছেন। অন্যজন কলকাতা থেকে আসা সঞ্জয়, যে মাস ছয়েকের ওপর বিল এর কোম্পানিতে কাজ করছে। উচ্চশিক্ষা বা মেধা নয়, এদের পরিশ্রম করার ক্ষমতাই আই.টি. ব্যবসায়ীদের মূলধন। যাকে বলা হয় বডি শপিং বিজনেস। আমেরিকানদের তুলনায় এদের কম মাইনে দিয়ে, দীর্ঘসময় কাজ করিয়ে নিয়ে বিল এর মতো প্রফেশন্যাল ব্যবসায়ীরা মোট উপার্জন করেন। তা সত্ত্বেও সঞ্জয়রা দেশে ফিরতে চায় না। এক্সপ্লয়টেশনের ব্যাপারটি দু পক্ষের কাছেই স্পষ্ট। বিলরা জানেন, যারা দেশ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসছে, তারা সকলেই সমান সত্যবাদী নয়। তাদের জাল ডিপ্লোমার মাহাত্ম্য কাজে কর্মে ধরা পড়ে। ভুলত্রুটির গুনাগার মালিককে দিতে হয়। সঞ্জয়রা ও জানে স্বল্পবিদ্যা নিয়ে আমেরিকায় আসার এবং থেকে যাওয়ার এমন সুযোগ সহজে পাওয়া যাবে না। অতএব, টিঁকে থাকাই বড় কথা।

কিন্তু নাটকের সঞ্জয়ের সেখানেই সমস্যা দেখা দিল। একদিনের নোটিশে বিল তাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করলেন। সঞ্জয়ের পেশাদারী অযোগ্যতার জন্যে তাঁর ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। তাকে আর অফিসে রাখবেন না। সঞ্জয়ের আমেরিকার ভিসার মেয়াদ নির্ভর করছে এই চাকরির ওপর। বিল বুঝিয়ে দিলেন তাকে এখনই দেশে ফিরে যেতে হবে।

ওই সন্ধ্যেয় শুরু হল সঞ্জয়ের টিঁকে থাকার লড়াই। প্রথমে সে বিল এর সহানুভূতি, দয়া ভিক্ষা করে চাকরিটি ফিরে পেতে চাইল। বিল জানালেন তিনি নিরুপায়। শেষে বিরক্ত হয়ে সাফ জবাব দিলেন সঞ্জয়ের মতো মিথ্যেবাদী, অযোগ্য লোককে আর স্পনসর করবেন না। জেরার মুখে পড়ে সঞ্জয় স্বীকার করতে বাধ্য হল, সে কোলকাতায় রিক্রুটিং এজেন্টকে ঘুস দিয়ে, জাল সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছে। বিলকে কোনো ভাবে বোঝাতে না পেরে মরীয়া সঞ্জয় সেই রাতে অফিসের মধ্যে তাঁকে ঘেরাও করলো। কি পরিস্থিতির জন্যে সে আমেরিকায় পালিয়ে এসেছিল এবং ফিরে গেলে কেন তার মৃত্যু অনিবার্য— এ সম্পর্কে প্রথমে একটি কাহিনি শোনাল। বহুদর্শী বিল সে কাহিনি বিশ্বাস করলেন না। সঞ্জয়ের দ্বিতীয় কাহিনিও ধোপে টিঁকলো না। তখন সে আবার বিল্‌কে অনুনয় বিনয় করে স্পনসরশিপের কথা বলল। দীর্ঘ সময় দুটি মানুষ কাছাকাছি বসে আছে। এক বোতল পানীয়ের মাহাত্ম্যে দুজনের মধ্যে মানসিকতার দূরত্ব ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। কথাবার্তার মাঝে সঞ্জয় এই প্রৌঢ় লোকটির ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক নিঃসঙ্গতার আভাস অনুভব করছিল। বিত্তবান সফল এক পুরুষের ব্যর্থ জীবন, বিবাহবিচ্ছেদ, একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে তার স্ত্রীর দেশে চলে যাওয়া। যার বয়স হয়ত এখন সঞ্জয়েরই মতো ....। বিল্ ধীরে ধীরে এক হারানো সময়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

বিল্-এর অসতর্ক মুহূর্তের আত্মকথনের সূত্রটুকু ছিল সঞ্জয়ের খেলার শেষ চাল। বিল্-এর বাঙালি নাম, পদবী, স্ত্রী আর ছেলের নাম। অনেক কথাই তার জানা হয়ে গেছে। চলে যাওয়ার আগে অফিসের ভেতরদিকে শেলফে রাখা একটি ছোট ছেলের ছবি দেখে সঞ্জয় তার শেষ কাহিনির জন্যে প্রস্তুত হল। এমন নিপুণ ও বিশ্বাসযোগ্য এবারের বিবরণ, যে বিল্ বিস্ময়ে অভিভূত! কোনও সংশয় নেই। হারানো সন্তান আজ ঘটনাচক্রে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইছে। ভিসা নয়, চাকরি নয়, জন্মসূত্রে আমেরিকান সঞ্জয় তার উত্তরাধিকারের দাবিতে চিরকাল এদেশে থাকবে। এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে সঞ্জয়কে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। সঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। নাটকের এই শেষপর্বে অভিভূত পিতৃ-হৃদয়ের একটি মাত্র সংলাপে কাহিনির মোড় ঘুরে গেল। সন্তানকে ফিরে পাওয়ার প্রগাঢ় উচ্ছ্বাসে বিল্ যখন তার

শিশুকালের এক দুর্ঘটনার কথা বললেন, সঞ্জয়ের সম্বিৎ ফিরে এল। তার পিঠে তো কোনও দুর্ঘটনার আঘাতের চিহ্ন নেই। বিল্ কেন তা বার বার দেখতে চাইছেন? মায়া? বাৎসল্যের আবেগ? না অবিশ্বাস? শেষবারের মতো তাকে যাচাই করে নিচ্ছেন? সে আর মানসিক চাপ সহ্য করতে পারছিল না। প্রবঞ্চনার জন্যে বিবেকের টানাপোড়েনে ক্লান্ত, পরাজিত সঞ্জয় মিথ্যার আবরণ সরিয়ে নিল। অথচ বিল্ এই রূঢ় সত্যকে গ্রহণ করতে পারছেন না। এই মিথ্যাই তবে সত্য হোক। প্রবাসে দুঃসহ একাকিত্বের মাঝে সঞ্জয় হোক তাঁর শেষ অবলম্বন।

সঞ্জয় মন প্রস্তুত করে নিয়েছে। কোনও প্রলোভনেই সে মিথ্যা পরিচয় নিয়ে বিদেশে থাকবে না।তার মা আছেন। মাতৃভূমি আছে। সেখানে ফিরে যাবে।

জীবনে সত্যই স্থায়ী। উপনিষদের বাণীর অমোঘ শক্তি কি ভাবে বিবেকবোধ জাগ্রত করে, "সত্যমেব" নাটকের পরিণতি সেই শাশ্বত মূল্যবোধের কথা বলে। এখানে আদর্শবাদের পাশাপাশি দুই প্রজন্মের বাঙালি পুরুষের মানসিকতার আভাস আছে। তাদের দীর্ঘ কথোপকথনে দুই পৃথিবীর সমকালের বাস্তবচিত্রটি পরিস্ফুট হচ্ছে। একদিকে দেশের ছেলেদের বিদেশে আসর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে অভিবাসী মানুষের নস্ট্যালজিয়া, বিচ্ছিন্নতাবোধ, বিষন্নতা। যদিও এর কোনওটিকেই সর্বজনীন অনুভূতি বা সাধারণলক্ষণ বলে চিহ্নিত করা চলে না। তবু সুদীপ্তর নাটকে এমন কিছু ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে। দেড় ঘণ্টার নাটকে কাহিনির গতি অব্যাহত রেখেছে মূলত সঞ্জয়ের চরিত্রটি। কল্পনা আর বাস্তবের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে বারে বারে সে ঘটনার চমক উপহার দিয়েছে। ওই ভূমিকায় ছিলেন পিনাকী দত্ত। অভিব্যক্তি, মিথ্যে গল্প বলার সময় শরীরী অভিনয়, সংলাপ উচ্চারণে নাটকীয়তার প্রয়োগ, শেষদৃশ্যের উপলব্ধির মুহূর্তে মানসিক দৃঢ়তা—পিনাকী "চরিত্রটি"কে যথাযথ রূপ দিয়েছেন। বিল্-এর ভূমিকায় সুদীপ্ত ভৌমিকের অভিনয় একাধিক মাত্রার সংযোজনে মালিকের রাশভারী ব্যক্তিত্ব থেকে এক অসহায় দুঃখী মানুষে রূপান্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। নির্দেশনার জন্যে বিশেষ প্রশংসা পাবেন ইন্দ্রনীল মুখার্জি।

নাট্য উৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক ছিল "অসময়"। রচনা সুদীপ্ত ভৌমিক। পরিচালক শৌভিক সেনগুপ্ত। "থিয়েটার প্র্যাকটিশনার্স অফ ক্লিভল্যান্ড, ওহায়ো" নামে নাট্যসংস্থার এই প্রযোজনাটি শ্রুতি নাটকের আঙ্গিকে মালটি মিডিয়া প্রেসেন্টেশনের ধারায় পরিবেশিত হল। দুটি চরিত্র মঞ্চে বসে এবং তৃতীয়জন ছবির পর্দায় অভিনয় করলেন।

কাহিনির পটভূমি আমেরিকার এক ছোট শহর। সময় মধ্যরাত। ফোনের শব্দে জেগে উঠেছে এক বাঙালি দম্পতি। সিদ্ধার্থ আর কমলিকা। কে ফোন করেছিল? লাইনটা কেটে যেতে কিছু জানা গেল না। আবার ফোন বাজছে। এবারেও কথা বলা গেল না। কে ফোন করছে? কথাবলার আগে রেখে দিচ্ছে কেন? সিদ্ধার্থ, কমলিকার ঘুম আসছে না। চিন্তা হচ্ছে, দেশের বাড়িতে কি কোনও বিপদ হল? কমলিকা নিজেদের বাড়ির খবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। সিদ্ধার্থের বাড়ির খবর পাওয়া গেল ওদের পাশের বাড়ির সত্যেনকাকার নম্বরে ফোন করে। কোনও দুঃসংবাদ নেই। সিদ্ধার্থ, কমলিকার স্বস্তি পাওয়ার কথা। দুজনের পরদিন অফিস আছে। ঘুম দরকার।

কিন্তু সিদ্ধার্থর মধ্যে কেমন যেন উদ্বেগ, অস্থিরতার আভাস পাচ্ছে কমলিকা। এত বিষণ্ণতা কেন? সিদ্ধার্থ আক্ষেপ করছে বাবা মার বৃদ্ধ বয়সে তার কাছে থাকা উচিত ছিল। তাঁদের দেখাশোনার সব দায় ভাই-এর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে স্বার্থপরের মতো দূরে বসে আছে। আমেরিকায় আর ওর ভালো লাগে না। বাবা, মার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কমলিকার যুক্তি সিদ্ধার্থর অপরাধবোধের কোনও কারণ নেই। সে চিরকাল বাবা, মার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ডলার পাঠিয়ে যাচ্ছে।.... দুজনের মধ্যে কথাবার্তা ক্রমশ তর্কে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার ফোন এলো। কমলিকা হ্যালো হ্যালো করছে। ওপাশে সাড়া নেই। কমলিকা প্রচণ্ড বিরক্ত....হঠাৎ সিদ্ধার্থ জানালো—আজ তার চাকরি চলে গেছে। কমলিকা স্তম্ভিত! সিদ্ধার্থ এতক্ষণ কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল কেন? তাই এত উদ্বেগ? এ জন্যে আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে চাইছে? কিন্তু কমলিকা কিছুতেই রাজি হবে না। তার পক্ষে আমেরিকার স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে অন্য পরিবেশে থাকা সম্ভব নয়। কমলিকার জেদ, অসহযোগিতায় সিদ্ধার্থ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। সামনে অনিশ্চিত পরিস্থিতি। দুর্দিনের বাজারে এদেশে ভালো চাকরি পাওয়া কঠিন। অনেক দেনা করে বিশাল বাড়ি কিনেছে। ব্যাংকে মাসে মাসে ঋণ শোধ করছে। সংসার আছে। বিলাসবহুল জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক খরচও কম নয়। কমলিকা এই বাস্তব সমস্যা বুঝতে চাইছে না। বিবেচনা নেই, সহানুভূতি নেই। শুধু স্বার্থপরের মতো চিৎকার করে যাচ্ছে।

নিরাপত্তাহীনতার মুহূর্তে সিদ্ধার্থ কি শুধু কমলিকার সমবেদনা আশা করেছিল? তবে সকালে অফিস থেকে বিপাশাকে ফোন করেছিল কেন? স্ত্রীকে নয়, দেশে তার প্রথম প্রেমিকাকে নিজের চাকরি হারানোর কথা জানিয়েছিল। সিদ্ধার্থ বিপাশার কাছে ভালোবাসার আশ্রয় ভিক্ষা করে বলেছিল, দেশে ফিরে গেলে বিপাশা কি তাকে গ্রহণ করবে?

বিপাশা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। একদিন আমেরিকার মোহে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় সিদ্ধার্থ তাকে ছেড়ে চলে এসেছিল। কতবছর যোগাযোগ রাখেনি। আজ সুখের সময় নয় বলে, হার মেনে পালিয়ে যেতে চাইছে। স্ত্রীকে ছেড়ে বিপাশার কাছে সান্ত্বনা খুঁজছে। বিপাশার তীব্র ভর্ৎসনা সিদ্ধার্থর কানে বাজছিল।

তবে গভীররাতে ফোন এলো কেন? বিপাশা কি সিদ্ধার্থকে খুঁজছে? হয়ত আরও কিছু কথা ছিল। সিদ্ধার্থর অনুমান সত্য হল। বিপাশা তার কঠিন কথাগুলোর জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইছে। সিদ্ধার্থ তার কান্নাজড়ানো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে..... কমলিকা স্তব্ধ! সে বুঝতে পারছিল, কেন এতবছর বাদে ও সিদ্ধার্থ পাশের বাড়ির সত্যেনকাকার ফোন নম্বর ভুলে যায়নি। সত্যেনকাকার মেয়ে বিপাশা কি তবে আজও সিদ্ধার্থের প্রতীক্ষায় আছে?

রাত শেষ হয়ে এসেছে। আমেরিকার শহরতলির সেই বিশাল বাড়িতে বিচ্ছিন্ন দুজন মানুষ। প্রেম নেই। বিশ্বাস নেই। অসময়ের ঝড় ভেঙে দিয়ে গেছে পদ্মপাতার সংসার।

"অসময়ে" সিদ্ধার্থ ও কমলিকার ভূমিকায় ছিলেন শৌভিক সেনগুপ্ত ও মৌসুমী সেনগুপ্ত। পেছনে চলচ্চিত্রের পর্দায় বিপাশা। মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে শিল্পীর অভিব্যক্তি সহ যে শরীরী অভিনয়ের সুযোগ থাকে, শ্রুতিনাটক সেক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর নির্ভর। ভাব প্রকাশ, সংলাপ উচ্চারণ ও স্বরপ্রক্ষেপনে সেটি যথার্থ নাটক হয়ে ওঠে। কখনও পরিবেশনের ত্রুটিতে অতিনাটকীয় অথবা পাঠ বলে মনে হয়। কমলিকার ভূমিকায় মৌসুমী সেনগুপ্ত অসামান্য দক্ষতায় সেই ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তাঁর বাচনিক অভিনয় মনে রাখার মতো। বিপাশার ভূমিকাভিনেত্রী পর্দায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন। সিদ্ধার্থের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী শৌভিকের অভিনয়ে আবেগের মাত্রা, নাটকীয়তা কিছু বেশি ছিল। বেতার নাটকের স্টাইলের মতো একটু গতানুগতিক লেগেছে। এই শ্রুতিনাটকে মালটি-মিডিয়া প্রেজেন্টেশনের অভিনব পরিকল্পনা, আবহসংগীত ও পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন শৌভিক সেনগুপ্ত।

নাট্যউৎসবের শেষ নাটক ছিল "ট্যাকোনিক পার্কওয়ে। রচনা ও পরিচালনায় সুদীপ্ত ভৌমিক। কাহিনির পটভূমি নিউইয়র্ক স্টেটের একটি শহর। সেখানে প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকে ধনী দম্পতি দীপক শারিকা। কলকাতা থেকে নাটক করতে আসা একটি দলের

প্রধান শিল্পী হয়ে এসেছে টলিউডের অভিনেতা মনসিজ। দীপক আর শারিকা তাকে দুদিনের জন্যে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। নাটক শুরু হচ্ছে একটি সকালের দৃশ্য থেকে। শারিকা অতিথেয়তার ফাঁকে ফাঁকে মনসিজের সঙ্গে গল্প করছে। দীপক ফোটোগ্রাফি চর্চা করে। তার শখ একটি ছবি পরিচালনা করবে। ছবিতে নায়িকা হবে তাদের মেয়ে পম। মনসিজকে ও তার সঙ্গে অভিনয় করতে হবে। দীপক যখন প্রবল উৎসাহে তার পরিকল্পনার কথা বলছে, শারিকা হঠাৎ চিৎকার করে বাধা দিল। সে কিছুতেই পমকে অভিনয় করতে দেবে না। দীপক তা মানতে চাইছে না। মনসিজ ভাবে যাকে নিয়ে ওদের মধ্যে এত তর্ক হচ্ছে, সেই পম কোথায়? জিজ্ঞেস করে কোনও স্পষ্ট উত্তর পেল না।

দীপক যখন বাড়ির নিচের ঘরে মুভির সাজসরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত, শারিকা জানায় মনসিজকে সে একসময় চিনতো। ওদের বেহালার বাড়িতে মনসিজ দু/একবার গিয়েছিল। সুদর্শন যুবকটি তখন ওই অঞ্চলে নাটক করতো। পাড়ার অন্য মেয়েদের মতো শারিকাও তার সম্পর্কে মোহমুগ্ধ ছিল। আজ এত বছর বাদে দেখা হতে, তাই বাড়িতে নিয়ে এসেছে। মনসিজ বাংলা ছবির বিখ্যাত নায়ক। শারিকার কথাগুলো উপভোগ করছিল। ওকে চিনতে না পারলেও শারিকার বাবা বিকাশ মল্লিকের নাম শুনে মনে করতে পারল।

দীপক ঘরে ঢুকল। মাথায় সেই এক চিন্তা। পম আর মনসিজকে নিয়ে দারুণ ছবি তৈরি করবে সিনেম্যাটোগ্রাফির নানা কৌশল সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। ক্যামেরার চোখ দিয়ে ছবির দৃশ্যগুলো বর্ণনা

করে যাচ্ছিল। মনসিজ লক্ষ্য করছিল দীপকের মধ্যে এক অদ্ভুত প্যাশন কাজ করছে। ছবিটাই যেন তার আবেগকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। শারিকাই বা এমন বিক্ষুব্ধ কেন? দীপকের সঙ্গে যে ধরনের কথা বলছে, যেন মেয়ের সম্পর্কে দীপকের অস্বাভাবিক দুর্বলতা বা অবসেশন মনসিজ খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। বৈভবের আড়ালে গৃহযুদ্ধের এই নগ্ন ছবিটি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। শারিকা কি মানসিক ভাবে অসুস্থ? নিজের মেয়েকে নিয়েও স্বামীকে সন্দেহ করে?

শারিকা তখন জানায় তা কৈশোরের অকল্পনীয় অভিজ্ঞতার কথা। এক সময় সে তার বাবা বিকাশ মল্লিকের যৌন বিকৃতির শিকার হয়েছিল। তীব্র ঘৃণা আর আতঙ্কে এই বয়স থেকেই পুরুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে। পম তাদের পালিতা মেয়ে। দীপকের নিজের সন্তান নয়। পমের ওপর দীপকের আগ্রাসী স্নেহ, আদরের অতিশয্য শারিকা ভালো চোখে দেখে না। তার সন্দেহ দীপকের আবেগের মধ্যে যৌন কামনা লুকিয়ে আছে। কেন সে সর্বক্ষণ পমকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে? কেন দীপক চায় না পম বাইরের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করুক? তার কারণ ঈর্ষা। শারিকা তাই গোপনে পমকে সাবধান করে দিয়েছিল।

নাটকের এই পর্বে দীপকের কাহিনি শুরু হয়। পমের শৈশব থেকে বড় হওয়ার কথা, তাকে ঘিরে দীপকের অপত্য স্নেহ, মায়ামমতার কথা সে নাটকের স্বগতোক্তির মতো বলে যায়। মনসিজ শোনে।

কাহিনিতে পমের বয়ঃসন্ধি পার হয়ে যায়। আরও বড় হয়। তবু দীপক তাকে স্বাধীনতা দিতে চায় না। তার ভয় বাইরের জগৎ, পুরুষবন্ধুরা পমকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। পিতার ভূমিকা রক্ষকের। পমকে সে সুরক্ষাগণ্ডির এপারে ধরে রাখতে চায়। হয়তো এই যুক্তিতেই সে পমকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। পম রাগ করতো। অভিমান করতো।

এক শীতের বিকেলে বরফ পড়ছিল। বাইরে থেকে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো। দীপক ডাকাডাকি করে সাড়া পেল না। বাইরে বরফের ঝড় শুরু হয়েছে। শারিকা গেছে তার নাচের স্কুলে। দীপক ভাবছিল মেয়েটা হঠাৎ ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল কেন? কিছুক্ষণ পরে দোতলায় গিয়ে দেখল পমের ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করা। দীপকের চিন্তা হচ্ছিল। একটা পিন ঘুরিয়ে দরজা খলল। পম বিছানায় ঘুমোচ্ছে। দীপক দেখছিল ওর ঘুমন্ত মুখে সেই ছোটবেলার প্রশান্তি। দীপক পমের কপালে ছোট্ট চুমু খেল। পম জেগে উঠল। চোখে বিস্ময়, ভয়। ছুটে নিচে নেমে গেল। দীপক ডাকছে। বাইরে অন্ধকারে বরফের ঝড়ে পথঘাট ঢেকে গেছে। পম উদভ্রান্তের মতো গাড়িতে উঠে বসলো। দীপক বাধা দিতে চেষ্টা করল। পম দীপকের কাছ থেকে পালিয়ে শারিকার কাছে যাওয়ার জন্যে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। দীপক আর শারিকা পমকে শেষবার দেখল হাসপাতালে। ট্যাকেনিক পার্কওয়েতে গাড়ির দুর্ঘটনায় পম মারা গেল।

নাটকে একটি চমক বাকি ছিল। গল্পের শেষে চোখের জল মুছে শারিকা হঠাৎ হেসে উঠল। দীপক বলল পম নিশ্চয়ই তার ছবিতে অভিনয় করবে। মনসিজের সঙ্গে পমের দেখা হবে। মনসিজ বিভ্রান্ত, হতবাক! এদের কোন অংশটা তবে অভিনয়?

ট্যাকোনিক পার্কওয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর গল্প। সংসারে কখনও কখনও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। নিকটজনের যৌন লালসার শিকার একটি মেয়ে কি ভাবে বাকি জীবন সেই দুঃস্বপ্নের ভার বহন করে, অবিশ্বাস, সন্দেহে জর্জরিত শারিকা তার প্রতিচ্ছবি। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। শারিকার অকারণ সন্দেহের জন্যে মূল্য দিয়েছে দুটি সুস্থ সম্পর্কের মানুষ। নাটকের পরিণতিতে সুদীপ্ত আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন— প্রবৃত্তিই শেষ কথা নয়। দীপকের মতো অমলিন, পাপবোধহীন একটি চরিত্র নাট্যবস্তুর কাঠামোটি ধরে রাখে।

নাটকে মনসিজের ভূমিকায় ছিলেন পিনাকী দত্ত। বিগতদিনের সিনেমার নায়কের মতো গায়ে শাল জড়িয়ে হাঁটা চলা, কথার ভাবভঙ্গি ভালোই রপ্ত করেছেন। শেষদৃশ্যে তাঁর দুচোখে গভীর বিস্ময় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শারিকার ভূমিকায় কেকা সরকার স্বচ্ছন্দ, সংযত অভিনয় করেছেন। মানসিক যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। তবে মনসিজ ও দীপকের তুলনায় শারিকাকে একটু বয়স্কা লেগেছে। দীপকের ভূমিকায় ইন্দ্রনীল মুখার্জি প্রথম সারির পেশাদারী শিল্পীর যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বিভিন্ন মুডে তাঁর অভিব্যক্তি, সংলাপ উচ্চারণ, আবেগের ওঠা পড়া, শরীরী অভিনয় দর্শকদের অভিভূত করেছে। যে মানুষ ক্যামেরার লেনস্ দিয়ে পরিপার্শ্বকে দেখে, সে যখন চলচ্চিত্রের ছোট ছোট দৃশ্য তোলার ভঙ্গিতে তার মেয়ের শৈশব থেকে মৃত্যুদৃশ্য পর্যন্ত বর্ণনা করে, ইন্দ্রনীল সেই চরিত্রের সঙ্গে যেন সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

সুদীপ্ত ভৌমিকের রচনা ও পরিচালনা দর্শকদের একটি অভিনব নাটক উপহার দিয়েছে। অভিবাসী বাঙালি জীবন কেন্দ্রিক তিনটি নাটক আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে মঞ্চস্থ হোক, নাট্যকারকে এই অভিনন্দন জানাই।